## আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে
## বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে
## রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি

# আহ্বান

জানুয়ারি ২০২৬

**বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)**
**বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)**

---

২০২৬ সালের ৯-১০ জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এবং পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সহযোগে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) আয়োজিত 'বাংলাদেশের পরিবেশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়' বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত।

# ভূমিকা

বিগত কয়েক দশকের বহু ভ্রান্ত নীতি এবং অদক্ষ ও অসৎ বাস্তবায়নের ফলে দেশের পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশের সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট নিরসনের জন্য স্বল্প-পরিধির পরিমাণগত পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন গুণগত পরিবর্তন। কিছু ক্ষেত্রে তা হবে মোড় পরিবর্তন; অনেক ক্ষেত্রে তা হবে ১৮০-ডিগ্রী দিক পরিবর্তন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী যাত্রা। উপরন্তু, শুধুমাত্র নীতির পরিবর্তন যথেষ্ট হবে না। নীতি বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহেরও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন।

দীর্ঘ সময় পর দেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে যারা সরকার গঠন করবে তাদেরকেই পরিবেশ সংকটের সমাধান করতে হবে। সেলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) দেশের সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে পরিবেশের ইস্যুসমূহের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার এবং স্বীয় নির্বাচনী ইশতেহারে এ বিষয়ে বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের সমস্যাবলীর সমাধান স্পষ্ট হলেও সবক্ষেত্রের জন্য তা সত্য নয়। বাপা ও বেন প্রায় ৩০ বছর ধরে দেশের পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে এবং পরিবেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে গবেষণা এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে মাঠে সংগ্রাম করেছে। প্রতি বছর বাপা-বেন পরিবেশের কোনো নির্দিষ্ট একটি অথবা একাধিক ইস্যু নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করে এবং তাতে উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। দীর্ঘকালের এই গবেষণা ও মাঠের আন্দোলনের ভিত্তিতে এই পুস্তিকায় রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য পরিবেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হলো। আমাদের আশা যে, রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক পরিবেশ বিষয়ে স্বীয় অবস্থান নির্ধারণে ও নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে এসব পর্যবেক্ষণ ও পরিলক্ষণ সহায়ক হবে। নিম্নরূপ ৭টি মূল ক্ষেত্র অনুযায়ী এগুলো পরিবেশিত হলো।

১) পানিসম্পদ
২) জ্বালানী ও বিদ্যুৎ
৩) নগরায়ন ও ভৌত পরিকল্পনা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা
৪) কৃষি, মৃত্তিক ও খাদ্য দূষণ
৫) বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণ, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৬) বন, পাহাড়, টিলা, ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা
৭) উপকূল, বন্দর, ও সমুদ্র পরিবেশ সুরক্ষা

## ১। পানিসম্পদ

*পর্যবেক্ষণ*

পানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাপা, বেন, এবং অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠন বহুদিন ধরে নদনদীর প্রতি বিদ্যমান 'বেষ্টনী পন্থা'র পরিবর্তে 'উন্মুক্ত পন্থা' অনুসরণের সুপারিশ করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বহুলাংশে বেষ্টনী পন্থাই আঁকড়ে থাকছে। সম্প্রতি বাপা, বেন, বড়াল রক্ষা আন্দোলন, এবং অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনের দীর্ঘ দুই দশকের প্রয়াস এবং সবশেষে অন্তর্বর্তী সরকারের পানি সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার বিশেষ উদ্যোগের ফলে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) চারঘাটে বড়াল নদের মুখে ১৯৮৪ সালে স্থাপিত চার কপাটের স্লুইস গেটের কপাটগুলো অপসারণ করেছে। এই ছোট একটি পদক্ষেপের ফলেই বড়াল নদ প্রাণ ফিরে পেয়েছে এবং গঙ্গা থেকে পানির বিপুল প্রবাহ বড়াল নদে এবং চলন বিল এলাকায় প্রবেশ করছে। দীর্ঘ চার দশক ধরে অবরুদ্ধ বড়ালের এই আংশিক অবমুক্তি স্থানীয় জনগণের নিকট যেন একটি 'অলৌকিক' ঘটনা বলে প্রতিভাত হচ্ছে এবং তা দেখার জন্য চারঘাটে এখন শত শত মানুষের সমাগম হচ্ছে। নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থার উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের এরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনেকে যেন সুযোগের অপেক্ষায় আছেন কখন এই কপাটগুলো পুনঃস্থাপিত করে বড়ালের মুখ আবার বন্ধ করা যাবে! এতে প্রমাণিত হয় যে, পানি উন্নয়ন নীতির মৌলিক পরিবর্তন যথেষ্ট হবে না। পানি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহেরও সংস্কার প্রয়োজন। বেষ্টনী পন্থার প্রতি বাংলাদেশের পানি উন্নয়নের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের আকর্ষণের একটি বড় কারণ হলো বৈষয়িক। কাজেই দেশের নদনদীকে রক্ষা করতে হলে এসব সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রণোদনা কাঠামোর পরিবর্তন তথা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও নিতান্ত প্রয়োজন।

*সুপারিশসমূহ*

নীতির পরিবর্তন

১) নদনদীর প্রতি পন্থা বেষ্টনী-পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ এবং ইতিমধ্যে নির্মিত বেষ্টনী বাঁধসমূহকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এবং এদেশের বৃষ্টিপাত ও নদীপ্রবাহের চরম ঋতুভেদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী 'অষ্টমাসী বাঁধে' রূপান্তর করতে হবে।
২) বড়াল নদীসহ দেশের সকল নদনদীকে স্লুইসগেট, ফ্ল্যাপগেট, রেগুলেটর ইত্যাদি ফাঁস এবং ছিপি থেকে মুক্ত করতে হবে।
৩) আন্তর্জাতিক নদনদী সংক্রান্ত জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর করতে হবে।
৪) তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আগে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোর নিরসন করতে হবে।

নীতির পরিবর্তন

১) নদী বিষয়ক বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থা যেমন, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ, ইত্যাদিকে নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থায় প্রশিক্ষিত করতে হবে।

২) নদী বিষয়ক বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থা যেমন, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ, ইত্যাদির বৈষয়িক প্রণোদনা কাঠামোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে যাতে তাঁরা বেষ্টনী পন্থা পরিত্যাগ করে প্রকৃতসম্মত উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ করে।

৩) পানিসম্পদ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রকৌশলীদের প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে হবে এবং বহুশাস্ত্রীয়করণ করতে হবে।

৪) পানিসম্পদ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিদেশী অর্থায়ন সংস্থা এবং পরামর্শকদের উপর নির্ভরতার অবসান ঘটাতে হবে।

## ২। জ্বালানী ও বিদ্যুৎ

**পর্যবেক্ষণ**

কয়েক দশক ধরে বাপা, বেন, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা আন্দোলন, ও অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ কয়লার পরিবর্তে বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের দাবী জানিয়ে আসছে। অথচ, সরকার ২০০৮ সালে প্রণীত এবং ২০১৬ সালে সংশোধিত বিদ্যুৎ বিষয়ক মহা-পরিকল্পনাতে দেশে মোট ব্যবহৃত জ্বালানিতে কয়লার অংশ ২০১৬ সালের মাত্র এক শতাংশ থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী সরকার আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বহুসংখ্যক বৃহদাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। ফলে, এখন দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৩০ শতাংশ অব্যবহৃত থাকে এবং সেগুলোর অলস ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি, চড়াদামে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়। উপরন্তু, ২০০৮ সালে গৃহীত জ্বালানী নীতিতে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট ব্যবহৃত জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভাগ ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হলেও বাস্তবে তা এক শতাংশের কমে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং, সন্দেহ নেই যে, জ্বালানী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের পরিবেশের সুরক্ষা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের নীতির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। পাশপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের নৈরাশ্যজনক অগ্রগতি দেখায় যে, ভাল নীতি গ্রহণই যথেষ্ট নয়, তা বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন। সুতরাং, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতেও নীতি এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান উভয়েরই সংস্কারের প্রয়োজন।

***সুপারিশসমূহ***

নীতির পরিবর্তন

১) বর্তমানের বিদেশী অর্থায়ন ও পরামর্শকনির্ভর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ নীতি থেকে সরে এসে দেশীয় সক্ষমতার ভিত্তিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২) ভবিষ্যৎ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ চাহিদা সংক্রান্ত প্রক্ষেপণকে আরও বাস্তবসম্মত হতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যাতে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ এত বেশি না হয় যে, দেশকে অলস সক্ষমতার ক্ষতিকর দায়ভার বহন করতে হয়।

৩) নবায়নযোগ্যসূত্রে প্রাপ্ত জ্বালানির পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে কম উবগ উদগীরণকারি জীবাশ্ম জ্বালানি তথা গ্যাসের ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে। সে লক্ষ্যে দেশের ভেতরে (তথা স্থলভাগে) এবং বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের নিরংকুশ এখতিয়ারসম্পন্ন অংশে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন তৎপরতা জোরদার করতে হবে।
৪) গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে দেশীয় সক্ষমতার উপর বেশী জোর দিতে হবে।
৫) দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশের উপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে স্বাবলম্বী হতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ ও অংশ বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস করতে হবে।
৬) বৃহদাকার কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে গ্যাসনির্ভর মাঝারি আকৃতির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দিতে হবে।
৭) জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে। অষ্টমত, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হবে
২) জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রণোদনা কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে যাতে তাঁরা উপরে সুপারিশকৃত নীতির অভিমুখে জ্বালানী খাতকে বিকশিত করতে পারে এবং দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে।

## ৩। নগরায়ন ও ভৌত পরিকল্পনা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা

২০২৪ সালে নগরায়ন বিষয়ক সম্মেলনে বাপা-বেন লক্ষ করেছে বাংলাদেশে নগরায়নের ক্ষেত্রে দুই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি হলো দেশব্যাপী নগরায়ণকে সুষম করার সমস্যা; এবং দ্বিতীয় হলো ঢাকাসহ অন্যান্য নগরের অভ্যন্তরের সমস্যাবলী। এই দুই ধরনের সমস্যাবলীর প্রতিই নজর দেওয়া প্রয়োজন।

### ৩.১ দেশব্যাপী নগরায়নকে সুষম করার সমস্যা

***পর্যবেক্ষণ***

উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সাথে দেশের নগরায়নের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু নগরায়ন অত্যধিক মাত্রায় রাজধানীকেন্দ্রিক হচ্ছে। দেশের সার্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ হারে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা এখন মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে। এর ফলে একদিকে ঢাকা শহরে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বস্তুত, অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে ঢাকার পরিবেশ ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, দেশের সার্বিক নগরায়ন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। নগরায়নের ক্ষেত্রে দেশে আঞ্চলিক বৈষম্যের উদ্ভব ঘটেছে। এর পেছনে রয়েছে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য এবং তার ফলে সৃষ্ট মাথাপিছু আয় এবং দারিদ্র্য হারের বৈষম্য।

*দেশব্যাপী নগরায়ণকে সুষম করার লক্ষ্যে সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) বর্তমান অভিবাসনভিত্তিক নগরায়নের পরিবর্তে স্বস্থানে নগরায়নের কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
২) স্বস্থানে নগরায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'হাব-এন্ড-স্পোক' কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
৩) জেলা কিংবা উপজেলা শহরকে হাব হিসেবে উপযোগী করে তুলতে হবে। সেলক্ষ্যে আগের বিসিক শিল্প নগরী এবং সম্প্রতিকালের 'অর্থনইতিক জোন' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে জেলা কিংবা উপজেলা শহরকে হাব হিসেবে বিকশিত করার লক্ষ্যের অন্তর্গত করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
২) স্থানীয় সরকার কাঠামোতে জেলা পরিষদের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে।

## ৩.২ *নগরের অভ্যন্তরের পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা*

***পর্যবেক্ষণ***

দীর্ঘকাল যাবত বাপা, বেন, এবং অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন সমস্যাবলী শুধুমাত্র ঢাকা-কেন্দ্রিক নীতিমালা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না। বিগত দশকগুলোতে ঢাকা নগরের জনসংখ্যা অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির চেয়ে পাঁচগুণ বেশী হারে অভিগমনের কারণে স্ফীত হয়েছে। সুতরাং, দেশব্যাপী সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উপরে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী নিরসনেও সহায়ক হবে। পাশাপাশি এসব সমস্যাকে সরাসরি মোকাবেলাও করতে হবে। নগরের অভ্যন্তরের সমস্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো:

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

(ক) যাতায়াত এবং পরিবহন সংকট
(খ) আবাসন সংকট
(গ) উপযোগ সংকট
(ঘ) খেলার মাঠ, পার্ক, উদ্যান, উন্মুক্ত, ও সবুজ পরিসর রক্ষা
(ঙ) নগরের খাল, দীঘি, পকুরের দখল, দূষণ, এবং ভরাটকরণ
(চ) জলাবদ্ধতা
(ছ) নগরায়নের অন্যান্য সমস্যা

***নগরের অভ্যন্তরের সমস্যাবলী নিরসনের জন্য সুপারিশ***

নীতির পরিবর্তন

১) সামগ্রীকভাবে নগরায়নকে গণমুখী হতে হবে।
২) যাতায়াতব্যবস্থাকে গণ-পরিবহনভিত্তিক করতে হবে।

৩) আবাসন ব্যবস্থাকে স্বল্পআয়ীজনবান্ধব করতে হবে।
৪) নগরকে নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থাভিত্তিক হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ডেভেলপারের ভূমিকা থেকে সরে এসে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় মনোযোগ দিতে হবে।
২) নগর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ।

## ৪। কৃষি, মৃত্তিকা ও খাদ্য দূষণ

### *৪.১ কৃষি জমি ও গ্রামীণ ভূপ্রকৃতি সুরক্ষার সমস্যা সংক্রান্ত*

*পর্যবেক্ষণ*

এ পর্যন্ত গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার ব্যক্তিখাতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার অধীনে ছিল এবং এখনো মূলত তাই আছে। তবে এর কিছু নেতিবাচক দিক ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। একটি হলো ক্রমাগতভাবে কৃষি জমির হ্রাস। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে উপর্যুক্ত বিভিন্ন কারণে প্রতি বছর প্রতি বছর প্রায় **১** শতাংশ কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রতিফল হলো ভূমি বিন্যাসের অরাজকতা। অতীতে গ্রামের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট বিন্যাস ছিল; এবং সেই বিন্যাসের একটা সৌকর্য ছিল। এখন সেটা হারিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু নতুন সৌকর্যসম্পন্ন কোনো বিন্যাস গড়ে উঠছে না। ইউরোপীয় দেশসমূহের গ্রামাঞ্চলের সৌকর্য একটি গর্বের বিষয়। বস্তুত, কয়েকটি দেশের গ্রামাঞ্চলের সৌকর্য ইউনেস্কোর 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। গ্রামের বর্তমান আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াকে সৌকর্য রক্ষাকারী করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং দেশব্যাপী ভৌত পরিকল্পনার তা একটি প্রণিধানযোগ্য উপদান হতে হবে। তৃতীয় একটি প্রতিফল হলো যত্রতত্র ইটভাটায় ব্যবহারের জন্য জমির উর্বর উপরিভাগ কর্তন। এরূপ আরেকটি প্রবণতা হলো মাছ চাষের জন্য অপরিকল্পিতভাবে পুকুর খনন। বিপরীতমুখে, অপরিকল্পিতভাবে গ্রামাঞ্চলের খাল-বিল-নদী-নালা-দীঘি-পুকুর ইত্যাদি ভরাট করে ফেলা। এসব বিভিন্ন প্রবণতা ও কর্মকান্ড গ্রামীণ ভূ-প্রাকৃতিক অরাজক পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছে।

*সুপারিশসমূহ*

নীতির পরিবর্তন

১) কৃষি জমি গ্রামীণ ভূ-প্রকৃতি রক্ষার বিষয়ে সচতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
২) গ্রামীণ ভূ-প্রকৃতি রক্ষার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে। সেলক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং সেই আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের বিধান করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক

১) কৃষিজমি ও ভূ-প্রকৃতি রক্ষার লক্ষ্যে বাঞ্ছিত আচরণের জন্য প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। এই প্রণোদনা কাঠামো নিরূপণের জন্য একটি উপযুক্ত কমিশন অথবা কমিটি গঠন করতে হবে।
২) কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং এই সহযোগিতার লক্ষ্যে এসব মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের করণীয়র যথাসম্ভব সুনির্দিষ্টকরণ এবং সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে এসব করণীয় কিভাবে, কোন পর্যায়ে, এবং কী ভূমিকা রাখবে, তা স্পষ্ট করতে হবে।
৩) এলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি বিশেষ সেল (কেন্দ্র) গঠন করতে হবে।

## *৪.২ মৃত্তিকার গুণাবলী সুরক্ষার সমস্যা*

***পর্যবেক্ষণ***

বাংলাদেশের জমি উর্বরতার জন্য খ্যাত। এই উর্বরতার মূল উৎস হলো নদীবাহিত পলিমাটি। যুগের পর যুগ এই পলিমাটি দিয়েই বাংলাদেশের ভূমিগঠন অগ্রসর হয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, বাংলাদেশের ভূমিগঠন ও জমি উর্বরতা রক্ষায় পলিমাটির এই ভূমিকা অনুধাবনে বিদেশী পানি বিশেষজ্ঞরা ব্যর্থ হন। তাঁরা বাংলাদেশে নদনদীর প্রতি বেষ্টনী পন্থা চাপিয়ে দেন যার ফলে প্লাবনভূমি এবং জোয়ারভূমি পলিবঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং একদিকে ভূমিগঠনের প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে পলি দ্বারা জমির উর্বরতা রক্ষার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। আরেকটি সহযোগী প্রক্রিয়া হয় জৈব সারের ব্যবহার হ্রাস। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকেরা বরং উত্তরোত্তরভাবে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পলিবঞ্চিত হওয়ার কারণে জমিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ধাতব উপাদানের (যেমন জিংক) ঘাটতি দেখা দেয়। সেসব ঘাটতি পূরণের জন্য সাধারণ সারের সাথে অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান যোগ করতে হয় এবং তা একদিকে উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যদিকে জমির রাসায়নিক-নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। প্লাবনসীমার ঊর্ধে অবস্থিত জমির পক্ষে স্বাভাবিক প্লাবনের বছরসমূহে পলিপতন দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই। উপরন্তু সেখানেও জৈব সারের ব্যবহার হ্রাসের ফলে সেসব জমিরও রাসায়নিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও পাচ্ছে।

***সুপারিশ***

নীতির পরিবর্তন

১) নদনদীর প্রতি বর্তমান বেষ্টনী পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবে।
২) জৈবসারের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।
৩) রাসায়নিক সার প্রয়োগের পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেখানে সম্ভব বর্তমান সার্বিক প্রয়োগের পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘শেকড়ে প্রয়োগ’ (রুট এপ্লিকেশন)’র পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) কৃষি এক্সটেনশন বিভাগকে জৈবসারের ব্যবহারের সম্প্রসারণ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের কৃচ্ছ্রতাসাধন অভিমুখী করতে হবে।
২) এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সবচেয়ে পারঙ্গমদের পুরস্কৃত করার পদক্ষেপ নিত্যে হবে।

### *৪.৩ খাদ্য দূষণের সমস্যা*

*পর্যবেক্ষণ*

বিভিন্ন ধরণের খাদ্য দূষণের সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। তার মধ্যে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা হলো কৃত্রিম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসময়ে ফল পাকানো অথবা ফলের রং পরিবর্তন। এর ফলে একজন ব্যক্তি শুধু যে ক্রেতা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন তাই নয়, তিনি শরীর-স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্থ হন। বস্তুত শেষোক্ত ক্ষতি মৃত্যুর মতো করাল রূপও ধারণ করতে পারে। খাদ্য দূষণের আরেকটি প্রচলিত রূপ হলো ভেজাল। দুধে পানি মেশানোর মতো পুরাতন পদ্ধতির বহু নতুন সংস্করণের উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষত ভোজ্য তেলে ভেজাল মেশানোর ঘটনা প্রায়শ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। হোটেল-রেস্টুরেন্টে পরিবেশিত খাদ্যেও নানা প্রকারের দূষণের উদাহরণ দেখা যায়। শিশুখাদ্যের দূষণ বিশেষভাবে দুঃখজনক।

*সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) খাদ্য দূষণের বিরুদ্ধে প্রচার জোরদার করতে হবে।
২) খাদ্য দূষণকারীদের সহজে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।
৩) নমুনা-চয়নের ভিত্তিতে প্রায়শ খাদ্যদ্রব্যের মোড়কে উল্লেখিত তথ্যের সাথে ভেতরে পরিবেশিত খাদ্যের তুলনা করে দেখতে হবে এবং ক্ষতিকর ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা দপ্তরের জনবল বাড়াতে হবে।
২) এই দপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩) স্থানীয় জনগণকে এই দপ্তরের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে।

# ৫। বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণ, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

## *৫.১ বায়ু দূষণ*

### *পর্যবেক্ষণ*

বাংলাদেশে নগরের গ্যাসীয় দূষণের একটি প্রকট উদাহরণ ছিল দুই স্ট্রোক-বিশিষ্ট স্কুটারসমূহ কর্তৃক কালো ধোঁয়ার উদগীরণ। বাপা-বেনের সংগ্রামের ফলে এসব স্কুটার অপসারণ করে সিএনজি চালিত ত্রিচাকাবিশিষ্ট যানের প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। বায়ু দূষণের আরেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ইটভাটাসমূহ। এই দূষণ এখন গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উদগীরণ এখন বায়ু দূষণের আরেক বড় উৎস। এক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে সিমেন্ট শিল্প। ধলেশ্বরী নদীর বুকে প্রতিষ্ঠিত বহু সিমেন্ট কারখানা এই নদীর দুই তীরের জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পাথর উত্তোলন, উন্মুক্ত স্থানে বিচূর্ণকরণ, ইত্যাদি বায়ু দূষণের আরেক উৎস। এই দূষণের ফলে জাফলংসহ দেশের নান্দনিক এবং পর্যটক-প্রিয় স্থানসমূহ বিনষ্ট হচ্ছে। বায়ু দূষণের সাথে শীতের কুয়াশা মিশ্রিত হয়ে যে 'ধুলিফগ'-র সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে বাংলাদেশের বিমান বন্দরসমূহে বিমান চলাচলে বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। বায়ু দূষণের ফলে জনগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটছে এবং গড় আয়ুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

### *সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) সনাতনী পরিপূর্ণ মাটিনির্ভর ইটের পরিবর্তে স্বল্প মাটির অথবা মাটিহীন বহু ধরণের এবং বর্জ্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত ইট ব্যবহার করতে হবে।
২) ইট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আধুনিক জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার করতে হবে।
৩) উপযোগী উচ্চতা ও স্ক্রাবার-সম্পন্ন চিমনির মাধ্যমে ইটভাটার ধোঁয়ায় ধূলিকণা ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে।
৪) ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া হ্রাস করতে হবে।
৫) ধলেশ্বরীর বুক থেকে সিমেন্ট কারখানাসমূহকে অপসারণ করতে হবে।
৬) বিদেশী সিমেন্ট কোম্পানিসমূহ বাংলাদেশকে দূষণের জন্য ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে; রপ্তানির জন্য সিমেন্ট উৎপাদন বন্ধ করেত হবে; অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পরিচালিত সিমেন্ট কারখানাসমূহের দূষণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
৭) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রসার বন্ধ করতে হবে; যেসব কেন্দ্র ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোকে গ্যাসে রূপান্তর করতে হবে।
৮) নদী ধ্বংসকারী পাথর উত্তোলন নিষিদ্ধকরণ: নির্মাণকাজে পাথরের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে। অপরিহার্য ব্যবহারের জন্য পাথর বিদেশ থেকে আমদানির সুযোগ দিতে হবে।
৯) 'ফিটনেস সার্টিফিকেট' ছাড়া যাতে কোনো গাড়ি চলাচল না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য প্রণোদনা কাঠামোর উপযোগী পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে তাঁরা সততার সাথে বায়ু দূষণ হ্রাসের জন্য কাজ করে।

২) গাড়ীর ফিটনেস পরীক্ষার সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

## *৫.২ তরল বর্জ্যের সমস্যা*

### *পর্যবেক্ষণ*

দুই ধরণের তরল বর্জ্য দেশের জলাধার এবং পরিবেশ দূষণের জন্য মূলত দায়ী। একটি হলো শিল্পের তরল বর্জ্য এবং অন্যটি হলো পয়ঃপ্রণালি। শিল্পায়ন তরল বর্জ্যের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প প্রচুর পানি ব্যবহার করে। মূলত, গভীর নলকূপের মাধ্যমে উত্তোলিত ভূগর্ভস্থ পানি দ্বারা এই চাহিদা মেটানো হয়। ফলে, একদিকে, এই শিল্পের কারণে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানি নিঃশেষিত হচ্ছে। অন্যদিকে, এসব শিল্প প্রচুর দূষিত পানি নির্গত করে। চামড়া শিল্পও তরল দূষণের জন্য অন্যতম দায়ী। এই দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে সরকার কলকারখানায় ইটিপি স্থাপনের উপর জোর দেয় এবং চামড়া শিল্পের জন্য সাভারে বিশেষ চামড়াপল্লী স্থাপন করে। কিন্তু, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং অদক্ষ বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হয়নি।

### *সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) তরল বর্জ্য উদগীরণকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পূর্ণাংঙ্গরূপে ইটিপি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২) তরল বর্জ্য পরিহার অথবা দূষণমুক্ত করার দায়িত্ব শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকেই নিতে হবে। সরকারের পক্ষে এই দায় গ্রহণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

৩) কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদনজনিত তরল বর্জ্য থেকে জলাধারসমূহ এবং মৎসসম্পদ রক্ষা করতে হবে। সেলক্ষ্যে রাসায়নিক উপাদানমুক্ত কৃষির প্রসারকে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) তরল বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের, স্থানীয় প্রশাসন, এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ টীম গঠন করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরকে এই টীমের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।

২) তরল বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) যাতে সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য 'হুইসেল ব্লোয়ার'-এর সুযোগ রাখতে হবে এবং সত্য তথ্য প্রদানকারীদের পুরষ্কারের বন্দোবস্ত করতে হবে।

৩) যেসব কারখানা তরল বর্জ্য যথাযথভাবে শোধন করে সেগুলিকে স্বীকৃতি ও পুরষ্কার প্রদান করতে হবে।
৪) পরিবেশ অধিদপ্তরের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

## *৫.৩ কঠিন বর্জ্যের সমস্যা*

*পর্যবেক্ষণ*

উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সাথে সাথে বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা দুই সূত্রে ঘটে। প্রথমত, উৎপাদন সূত্রে। দ্বিতীয়ত, ভোগের সূত্রে। বাপা প্রথম থেকেই বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়। বাপা লক্ষ করে যে, জমির প্রাচুর্য্যসম্পন্ন দেশসমূহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যে 'ল্যান্ড ফিল' পদ্ধতি অনুসরণ করে তা জমির প্রকট স্বল্পতাসম্পন্ন বাংলাদেশের জন্য উপযোগী নয়। বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করে বর্জ্য-মুক্ত অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে বেন ২০০০ সালে বর্জ্য থেকে সামাজিক পদ্ধতিতে জৈবসার উৎপাদনের একটি পাইলট প্রকল্প ঢাকা শহরের ভাসানটেক বস্তি এলাকা এবং গাজীপুরের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বাস্তবায়িত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সারা দেশে জুড়ে এ ধরনের বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বর্জ্যভিত্তিক শিল্পস্থাপনেও অগ্রগতি অর্জিত হয় নি। এদিকে বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কঠিন বর্জ্যের গঠনের উদ্বেগজনক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাপা-বেনের প্রচেষ্টায় ২০০২ সালে প্লাস্টিক ব্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা পুনরারোপিত হলেও এখনো তা পূর্ণরূপে প্রয়োগ হয় না। অন্তর্বর্তী সরকার প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের উপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এতে কতখানি সাফল্য অর্জিত হবে তা বলা কঠিন। প্লাস্টিক ব্যাগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের পণ্যের প্লাস্টিক মোড়কে দেশ ছেয়ে গেছে। এছাড়া, বিভিন্ন বিপজ্জনক বর্জ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

*সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) এমনসব উৎপাদন পদ্ধতি এবং ভোগের ধরন (প্যাটার্ন) উৎসাহিত করতে হবে যাতে বর্জ্যের পরিমাণ কম থাকে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
২) রিডিউস, রিইউজ, এন্ড রিসাইকেল নীতি বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হবে।
৩) নীতি কাগুজের পর্যায় থেকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করে তা থেকে অন্যান্য উপকারী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে হবে। এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।
৪) পাটের ব্যাগ, কাপড়ের ব্যাগ, এবং জৈব-পচনশীল ব্যাগের ব্যবহারকে চালু করতে হবে।
৫) যেক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার অপরিহার্য, সেক্ষেত্রে জৈব-পচনশীল প্লাস্টিক ব্যবহারের উদ্যোগ নিত্যে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) কঠিন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং নগর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে টীম গঠন করতে হবে।
২) কঠিন বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের যৌথ টীম গঠন করে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

### ৫.৪ শব্দ দূষণ

*পর্যবেক্ষণ*

শব্দ দূষণ সম্পর্কে বাংলাদেশে সচেতনতা খুবই কম। অথচ শব্দ দূষণ একটি বড় সমস্যা। এতে শুধু যে, মানুষের কাজে মনোযোগ দেওয়াতে বিঘ্ন ঘটে তাই নয়, জরীপে দেখা যায় যে, অত্যন্ত উচ্চ শব্দের অপরিস্থিতির কারণে অনেকের শ্রবণশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং, এক্ষেত্রেও একটি মোড় পরিবর্তন প্রয়োজন।

*সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) শব্দ দূষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে স্বীকার করতে হবে।
২) শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।
৩) গাড়ি চলাচলজনিত শব্দ দূষণ কমানোর লক্ষ্যে ট্রাফিক পুলিশকে ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

১) শব্দ দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, ট্রাফিক পুলিশ, এবং প্রশাসনের কর্মর্তাদের নিয়ে একটি যৌথ টীম গঠন করতে হবে।

## ৬। বন, পাহাড়,ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা

*পর্যবেক্ষণ*

একটি দেশের মোট আয়তনের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ বনের অধীনে থাকা উচিত বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। বাংলাদেশে এই পরিমাণ কমে এখন আনুমানিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মধুপুর বন প্রায় সর্বাংশে অপসৃত। গাজীপুরের শালবনও সেই পথে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় এবং বন বহুমুখী হুমকির মুখে। বন সংকোচনের ফলে স্থল-জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বেষ্টনী পন্থা অনুসরণের ফলে নদী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে জলজ জীববৈচিত্রও হ্রাস পেয়েছে।

### ৬.১ *হুমকির মুখে সুন্দরবন*

সুন্দরবনের অতি নিকটে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে এই বনের প্রতি হুমকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রামপালের প্রভাবে এই সুন্দরবনের উত্তর এবং পূর্বসীমায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে যেসব শিল্প ও বাণিজ্যিক স্থাপনা গড়ে উঠছে তার ফলে সুন্দরবনের ক্ষতি হওয়া অবধারিত। মংলা বন্দরের নিকট 'রপ্তানি প্রক্রিয়াজারকরণ অঞ্চলে'র প্রতিষ্ঠা এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করবে।

মংলা বন্দরের অধিকতর ব্যবহারের প্রয়াস পশুর নদীর দূষণ ডেকে আনছে এবং সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের জন্য যে ধরণের নিরিবিলি পরিবেশের প্রয়োজন তা বিনষ্ট করছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সুন্দরবনের অবক্ষয় আরও ত্বরান্বিত হবে এবং বাংলাদেশের এবং গোটা বিশ্বের জন্য এক অপরিমেয় ক্ষতির কারণ হবে।

### ৬.২ *বিপন্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের বন, পাহাড়, এবং পাহাড়ি জনগণের অধিকার*

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনও উজাড় হয়ে যাচ্ছে এবং তার একটি অন্যতম কারণ হলো পাহাড়িদের এলাকায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলীদের এনে বসতি স্থাপন। পাহাড়িদের জীবনযাত্রা বনের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল। সেজন্য শত শত বছর ধরে তাদের বসবাস সত্ত্বেও বনের ক্ষতি হয় নি। কিন্তু আশীর দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলিদের স্থানান্তর শুরু হয়। পাহাড়িদের নিজস্ব জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে পাহাড়িরা এক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এই সশস্ত্র সংঘাতের অবসান হয়। কিন্তু পাহাড়িদের মতে এই শান্তি চুক্তি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষত ভূমি মালিকানা বিষয়ে পাহাড়িদের বঞ্চনাবোধ অব্যাহত আছে। সমতলী অভিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে পাহাড়ের জন্য অনুপযোগী কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং তা পাহাড়ের পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। পাহাড়ের গা অনাবৃত করার ফলে পাহাড়ের গায়ের মাটি বৃষ্টির পানিতে নিকটবর্তী ছড়া এবং নদীতে যেয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং এগুলো ভরাট হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। সব মিলিয়ে পাহাড়ের পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। একইসাথে বন এবং বন্য প্রাণীও বিপন্ন হচ্ছে।

### ৬.৩ *বিপথগামী সামাজিক বনায়ন*

সামাজিক বনায়নের নামে সরকার সারা দেশে বিদেশী প্রজাতির একাসিয়া এবং ইউক্যালিপটাস গাছের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে এবং এসব গাছের অধীন জমিকে বনের হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের বনের পরিধি বাড়িয়ে দেখিয়েছে। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের মতে এসব গাছ বাংলাদেশের প্রকৃতির বরং ক্ষতি সাধন করছে।

### ৬.৪ *অনুপযোগী প্রজাতির মাছচাষ উৎসাহিতকরণ*

সরকারি সংস্থাসমূহ একদিকে দেশীয় মাছের উৎস জলাধারসমূহের ক্ষতি করছে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন বিদেশী প্রজাতির মাছের চাষ উৎসাহিত করছে। ফলে দেশীয় মাছের প্রজাতি-বৈচিত্র্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

### *সুপারিশ*

নীতির পরিবর্তন

১) পাহাড়ি এলাকায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলিদের অভিবাসন বন্ধ করতে হবে।

২) পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত যৌথ মালিকানাকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং এই নীতির ভিত্তিতে বিরাজমান ভূমি-মালিকানাগত বিরোধসমূহের দ্রুত অবসান করতে হবে।

৩) পাহাড়ের গা সম্পূর্ণ অনাবৃত করে বিভিন্ন ফলের চাষকে উৎসাহিতকরণ বন্ধ করতে হবে।

৪) বিভিন্ন প্রভাবশালী গ্রুপকে সহজেই বন এবং পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা বন্ধ করতে হবে।

৫) রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে গ্যাসে রূপান্তরিত করতে হবে।
সুন্দরবনের উত্তর এবং পূর্বপাশ জুড়ে শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা বন্ধ করতে হবে।
৬) সমুদ্র থেকে প্রায় একশত কিলোমিটার ভেতরে, সুন্দরবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পলিবালিসম্পন্ন পশুর নদীনির্ভর, এবং নাব্যতা বজায়ের জন্য সাংবাৎসরিক খননভিত্তিক মংলা বন্দরের উপর বেশী জোর দেয়ার বিষয়েও দ্বিতীয় চিন্তা করতে হবে।
৭) মধুপুরের বন পুনরুদ্ধার করতে হবে।
৮) গাজীপুরের শালবনের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার করতে হবে।
৯) সিলেটের পাহাড়ি বন এবং রাতারগুল জলজবনসহ দেশের অন্যান্য স্থানের বন রক্ষা করতে হবে।
১০) বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে আকাশিয়া, ইউক্যালিপটাস, ইত্যাদি বিদেশী প্রজাতির গাছমুক্ত করতে হবে।
১১) বিদেশী প্রজাতিনির্ভর বদ্ধ পদ্ধতির মাছ চাষের পরিবর্তে উন্মুক্ত জলাধারভিত্তিক দেশী প্রজাতির মৎসসম্পদ বিকাশের দিকে যথযথ মনোযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
১২) বদ্ধ-পদ্ধতির মাছচাষের ক্ষেত্রেও দেশীয় প্রজাতিসমূহকে উৎসাহিত করার নীতি অনুসরণ করতে হবে।
১৩) সমতলী আদিবাসীদের ভূমি-অধিকার রক্ষা করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১) বন বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে হবে।
২) পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম
৩) আঞ্চলিক পরিষদকে সে এলাকার বন, পাহাড়, ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।
৪) সমতলী আদিবাসীদের ভূমি-অধিকার রক্ষা এবং তাদের নিজস্ব জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি রক্ষা করে অর্থনৈতিক বিকাশ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

## ৭। উপকূল, বন্দর, ও সমুদ্র পরিবেশ সুরক্ষা

***পর্যবেক্ষণ***

***৭.১ উপকূলের বিশেষ সমস্যা***

বাংলাদেশের উপকূল জলবায়ুর অভিঘাত দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের যেসব অভিঘাত, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠার উচ্চতাবৃদ্ধির কারণে নিমজ্জন ও লবণাক্ততাঢ় প্রসার, নদনদীর ঋতুভেদ বৃদ্ধি, ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা ও প্রকোপ বৃদ্ধি, রোগ-বালাইয়ের হুমকি বৃদ্ধি, ইত্যাদি উপকূলকেই বেশী আক্রান্ত করছে। সেজন্য গোটা উপকূল আজ সংকটে এবং উপকূলের জনগণ ব্যাপকসংখ্যায় রাজধানী ঢাকা শহরে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে অভিগমন করছেন।

### *৭.২ পোল্ডার - উপকূলের সংকটের মূল কারণ*

উপকূলের বর্তমান সংকটের মূল কারণ এর পোল্ডারকরণ। পঞ্চাশের দশকে জাতিসংঘের 'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা' (এফ এও)'র অর্থায়নে এবং ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞদের পরমর্শেরভিত্তিতে এই পোল্ডারকরণ কর্মসূচি সূচিত হয়। এই কর্মসূচির অধীনে উপকূলকে শতাধিক অংশে খন্ডিত করা হয় এবং এগুলোর চারপাশে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে আশেপাশের সমুদ্র এবং নদনদী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। ফলে পোল্ডারের ভেতরে একটি কৃত্রিম শুষ্ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে প্রথম বছরগুলোতে পোল্ডারসমূহে শস্য-নিবিড়তা এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ক্রমশ পোল্ডারের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ স্পষ্ট হতে থাকে। পলিবঞ্চিত হওয়ার কারণে পোল্ডারের অভ্যন্তরে পলিপতনের মাধ্যমে ভূমিগঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পোল্ডারসমূহ ভূমি-অবনমনের সম্মুখীন হয়। প্রায় ৫০ বছর ধরে পোল্ডারের ভেতরে থাকায় সেখানে জমি পোল্ডারের বাইরে জমির তুলনায় প্রায় তিনফুট গভীরে চলে গেছে। এভাবে পোল্ডার পদ্ধতির প্রয়োগ দেশের উপকূলকে সমুদ্র পৃষ্ঠার নীচে ঠেলে দিচ্ছে। বাঁধের কারণে পোল্ডারের ভেতরের পানি নদীতে সরে যেতে পারে না। ফলে পোল্ডারসমূহে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে এরূপ জলাবদ্ধতা যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছে এবং ভবদহসহ অনেক স্থানে স্থায়ী এবং প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

### *৭.৩ মোংলা বন্দরের নাব্যতার সমস্যা*

মোংলা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার প্রয়াস উপকূলের জন্য এক বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করছে। সমুদ্র থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত এই বন্দরে জাহাজ পৌঁছাতে হলে পশুর নদী দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু পোল্ডারের কারণে পলি উপকূলের জমিতে পতিত হতে না পেরে নদীখাতে বেশি করে পতিত হয় এবং নদীর গভীরতা হ্রাস করে। ফলে পশুর নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে কৃত্রিম খননের প্রয়োজন হচ্ছে এবং খননকৃত বালি পশুর নদীর দুই পাড়ে নিক্ষেপ করে সেখানকার কৃষি জমি বিনষ্ট করা হচ্ছে। যেমন, মোংলা উপজলার বানিশান্তা ইউনিয়নের ৩০০ একর তিনফসলী কৃষি জমি বালি ফেলার জন্য হুকুমদখল করার পরিকল্পনা করা হয়। বানিশান্তার জনগণ এই গণবিরোধী এবং পরিবেশ-বিধ্বংসী সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে 'বানিশান্তা কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন' গঠন করেন এবং সংগ্রাম শুরু করেন। বাপা ও বেন বানিশান্তার জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই আন্দোলন লড়াকু চরিত্র গ্রহণ করে এবং সেখানকার নারীরা তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তীব্র এই আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং বানিশান্তা ইউনিয়নের কৃষিজমি বালিয়াড়ি হওয়ার পরিণতি থেকে রক্ষা পায়। বানিশান্তার এই বিজয় উপকূলের জনগণের পক্ষে বাপা ও বেনের সংগ্রামের সাম্প্রতিককালের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য। এটা দেখায় সঠিক নেতৃত্ব পেলে উপকূলের জনগণ তাদের স্বার্থের পক্ষে লড়াকু সংগ্রামে যেতে এবং বিজয় ছিনিয়ে আনতে প্রস্তুত।

## সুপারিশ

নীতি পরিবর্তন

১) উপকূলকে পোল্ডারের কুপ্রভাবমুক্ত করতে হবে। সেলক্ষ্যে পোল্ডারের বাঁধসমূহকে অষ্টমাসী বাঁধে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতর পলিপতনের মাধ্যমে ভূমি উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সমুদ্রসীমার নীচে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।
২) প্রতিটি গ্রামে গ্রাম-পরিষদ গঠন করতে হবে, যাতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই অষ্টমাসী বাঁধসমূহের ব্যবস্থাপনা করতে পারে।
৩) উপকূলের নদনদীকে স্লুইসগেট এবং ফ্ল্যাপগেটমুক্ত করতে হবে।
৪) দক্ষিণপশ্চিমের নদনদীকে সরু কালভার্ট, স্লুইসগেট, ও অন্যান্য পরিবন্ধকতামুক্ত করতে হবে, যাতে গঙ্গার বর্ষাকালীন প্রবাহ অনায়াসে উপকুলে পৌছাতে পারে।
৫) খননসৃষ্ট মাটি দিয়ে উপকূলের গ্রামসমূহকে সংবদ্ধ করে এগুলোর পাটাতন উঁচু করতে হবে এবং সেখানে গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানি ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাঁরা সাফল্যের সাথে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলা করতে পারেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১) পানি উন্নয়ন বোর্ডকে উপকূলের সমস্যা নিরসনে অষ্টমাসী বাঁধের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করতে হবে।
২) মংলা বন্দরের ব্যস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আরও জনবান্ধব হতে হবে এবং সামরিক মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে।
৩) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।
৪) বানিশান্তা জনগণের সফল সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বাপাকে উপকূলের নিমজ্জন এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের জলাবদ্ধতা অবসানের লক্ষ্যে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

## উপসংহার

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোড় পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছে। পরিবেশের জন্যও তা প্রযোজ্য। পরিবেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের গভীর পর্যালোচনার ভিত্তিতে উপর্যুক্ত সুপারিশমালা উপস্থিত করা হলো। এসব প্রতিটি বিষয়ে বাপা-বেনের আরও সুবিস্তৃত আলোচনা ও সুপারিশমালা রয়েছে, এবং বাপার ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তা একটি পৃথক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ তা থেকেও উপকৃত হতে পারে। বাপা-বেনের গবেষণা ও সুপারিশ সম্ভার ব্যবহার করে দেশের পরিবেশ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে আমরা উদাত্ত আহবান জানাই।

**যোগাযোগঃ**
রয়েল ইউনিক হাইট, ফ্ল্যাট # ১/বি, প্লট # ৪/এ, বি, সি (দ্বিতীয় তলা) সোবহানবাগ, ঢাকা-১২০৭
ইমেইলঃ bapa2000@gmail.com, মোবাইলঃ +৮৮০১৭১২১২১২২১, +৮৮০১৩২৯৭২৫৮২৫